বিলেতে মুক্তিযুদ্ধ

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

আজ যেমন সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মানুষ ছড়িয়ে আছে, ১৯৭১ সালে তা ছিল না। তবে যুক্তরাজ্য ও আমেরিকায় বেশ কিছু প্রবাসী বাঙালি বসবাস করতেন। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যেই ছিল সর্বাধিক সংখ্যক বাঙালি। সে সময়ের লক্ষাধিক বাঙালির বাস ছিল যুক্তরাজ্যে। বেশির ভাগই ছিলেন কর্মজীবী, তবে বেশ কিছু ছাত্রও ছিলেন। বিলেতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বেশ পুরানো। এটি প্রাথমিকভাবে বিরাজ করছিল মূলত প্রগতিশীল বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে। অবশ্য অন্যান্য বাঙালিরাও ক্রমান্বয়ে এতে শরিক হয়েছিলেন। এই চেতনাকে ঘিরেই ষাটের দশকেই গড়ে উঠে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'-এ প্রগতিশীল ছাত্রদের একটি গোষ্ঠী। সেটি একটি ছাত্রাবাস হওয়ায় সেখানে বসবাসরত ছাত্রদের সুযোগ ছিল বাঙালিদের অধিকার নিয়ে রাজনীতি চর্চা করার। সে সময়টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশসূলভ আচরণের কারণে, বাঙালিদের ভাষা এবং সংস্কৃতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের আক্রমণের কারণে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিকগোষ্ঠী দ্বারা গোটা পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্বের কারণে সকল প্রগতিশীল বাঙালিদের মনে গভীর ক্ষোভের। বেশ কয়েকজন সাহসী এবং রাজনৈতিক অধিকার সচেতন বাঙালি ছাত্র তখন যুক্তরাজ্যে পাঠরত ছিলেন, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আমিরুল ইসলাম (পরে ব্যারিস্টার), জাকারিয়া চৌধুরী (সদ্য প্রয়াত), মওদুদ আহমেদ (পরে ব্যারিস্টার, কয়েক মাস আগে প্রয়াত), আলমগীর কবির (পরে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক), বাদল রশিদ, শেখ আব্দুল মান্নান, জগলুল হোসেন, তোজাম্মেল হক, আব্দুর রাজ্জাক, লুৎফর রহমান শাজাহান, আমির আলি, ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী (পরে ব্যারিস্টার)। চিন্তা চেতনায় তারা সকলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তখন থেকেই ভাবতেন স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোনো ভবিষ্যত নেই। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই বাঙালির মুক্তি সম্ভব। নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতা দ্বারা তারা যুক্তরাজ্য প্রবাসী কর্মজীবীদের মধ্যেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বিস্তার করতে থাকে, আর এই চেতনায় উদ্বুদ্ধদের মধ্যে ছিলেন তোছাদ্দক আহমেদ, মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ, মোতালিব চৌধুরী, রমজান আলি প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধকালেও এঁরা সকলেই সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন।

ষাটের দশকের মধ্য এবং শেষ ভাগে বহু ছাত্র যুক্তরাজ্য গমন করলে বাঙালি চেতনায় উদ্বুদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে যায়। আর সে সময় যুক্তরাজ্যে নবাগতদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুলতান মাহমুদ শরিফ, মোহম্মদ হোসেন মঞ্জু, (সম্প্রতি প্রয়াত), জিয়াউদ্দিন মাহমুদ (পরে ব্যারিস্টার), নিখিলেশ চক্রবর্তী, সুবেদ আলি টিপু যারা বাঙালিদের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা বাঙালি সম্প্রদায়ের বাইরে প্রচারের প্রয়াসে বেশ কজন ইংরেজ, ভারতীয়, পাকিস্তানিকেও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। যাদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার থমাস উইলিয়ামস কিউসি (এমপি), পিটার শোর (এমপি), জন স্টোন হাউস (এমপি), লর্ড ব্রCকওয়ে, জন এনালস (মানবাধিকার নেতা), মার্টিন এনালস (এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব, গান্ধী শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত), মাইকেল বার্নস (এমপি), ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ (ওয়্যার অন ওয়ান্টের প্রধান), তারেক আলি (অক্সফোর্ডের ছাত্রনেতা এবং পরে শ্রমিক দলের নেতা), তারাপদ বসু (ইন্ডিয়া লীগ প্রধান), সিবগাত কাদরি (পরে ব্যারিস্টার এবং কিউসি)। ১৯৬৫ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার দাবি যুক্তরাজ্যের বাঙালি মহলেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে সময়ে যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগও বিশেষ ভূমিকা এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করে যা ছিল মূলত বাঙালিদের মধ্যে চেতনাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

১৯৬৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি এবং এতে পশ্চিম পাকিস্তানের নিষ্ক্রয়তার কারণে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যেও স্বাধীনতার দাবি প্রকট হয়ে উঠে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাঙালিরা বিশেষ ভূমিকায় নেমে পড়েন। তারা যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী এবং পার্লামেন্ট সদস্য ব্যারিস্টার থমাস উইলিয়ামস কিউসিকে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন সেই মামলায় বঙ্গবন্ধু এবং অন্যান্যদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ের জন্য। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয়ের পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের সন্দেহজনক আচরণের কারণে বাঙালিদের স্বাধীনতার প্রবণতা বাংলার মাটিতে প্রবল হলে তার ঢেউ যুক্তরাজ্যেও পৌঁছায়। স্বাভাবিক কারণেই প্রাথমিক উদ্যোগ নিতে হয় ছাত্রসমাজকে। তখন পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন ছিল সকল পাকিস্তানি ছাত্রদের সংস্থা, তবে এর মধ্যে বাঙালি ও পাকিস্তানি বিভাজন ছিল স্পষ্ট। সেই সংস্থার দফতর এবং কর্মকান্ড চলতো নাইটস ব্রিজ এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তান ছাত্রাবাসে। '৭০-এর নির্বাচনের পর রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে যুক্তরাজ্যের

ছাত্র রাজনীতিতে তার প্রভাব পরে, যার ফলে বাঙালি ছাত্ররা পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন থেকে আলাদা হয়ে বেঙ্গল স্টুডেন্টস একশন কমিটি গঠন করে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, জিন্নাহর ছবি এবং পাকিস্তানের পতাকা জালিয়ে দেয় ছাত্রাবাস থেকে। এটি গঠনের পেছনে মূল ভূমিকায় ছিলেন সুলতান মাহমুদ শরিফ, ওয়ালি আশরাফ, মোহম্মদ হোসেন মঞ্জু, লুৎফর রহমান শাজাহান, জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, নিখিলেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রথমত ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ইস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্টস একশন কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয় মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুকে, এবং দ্বিতীয় পদ দেওয়া হয় খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে (পরে বিএনপি নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ)। এই সংস্থার চতুর্থ অবস্থান দেওয়া হয় শফিউদ্দিন বুলবুল মাহমুদ (পরে ব্যারিস্টার) এবং পঞ্চম স্থানে রাখা হয় আমাকে। উল্লেখ্য যে, সদ্য পিএইচডি গবেষণার জন্য যুক্তরাজ্যে আসা খন্দকার মোশাররফ লন্ডন যাত্রার পূর্বে ছাত্রলীগের এক তুখোর নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর এক বড়ো মাপের সৈনিক ছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পুরো যুক্তরাজ্যব্যাপী দেড় শতাধিক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। কিন্তু বেঙ্গল স্টুডেন্টস একশন কমিটি ছিল দ্বিতীয় কমিটি। এর আগে কার্ডিফে সেলিম সাহেবের নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট নামীয় সংস্থাটি ছিল প্রথম কমিটি। মার্চের শেষের দিকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে এসে আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলে কমিটিগুলোর মধ্যে একতা নিশ্চিত হয় এবং একই সাথে স্টিয়ারিং কমিটি নামে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক কমিটি গঠিত হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন আজিজুল হক ভুইয়া, শেখ আব্দুল মান্নান, কবির চৌধুরী, মনোয়ার হোসেন, শামসুর রহমান। এর সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন ভিকারুননিসা স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ লুলু বিলকিস বানু। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে এসেই বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম এবং ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেনিস হিলিসহ বিভিন্ন বৃটিশ নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে বাঙালিদের দাবির কথা জানান। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জন্য আমরা মুখিয়ে ছিলাম এবং সেদিনই পাকিস্তান দূতাবাস দখল করার জন্য কয়েকশত লোক একত্রিত হয়েছিলাম। বিবিসি বাংলা বিভাগে সেরাজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় ঐ দিনই আমরা বঙ্গবন্ধুর বিশ্বনন্দিত ভাষণটি শুনতে পেরেছিলাম। আমরা হাইড পার্কে মিলিত হয়ে বিশাল শোভাযাত্রা নিয়ে পাকিস্তান দূতাবাস দখলের জন্য এগুতে থাকলে দূতাবাসের কাছাকাছি জায়গায় পুলিশ আমাদের বাধা দিলে দূতাবাস দখল সম্ভব হয়নি, তবে সেদিনের শোভাযাত্রা শুধু বাঙালিদের মধ্যেই নয়, ইংরেজদের কাছেও পাকিস্তানিদের দ্বারা গণহত্যার কথা পৌঁছাতে সহায়ক হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর আমাদের সংস্থার নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রাখি এবং এতে সেই ১২ জনের বাইরে আরো অনেককে সদস্য করা হয় যাদের মধ্যে ছিলেন ক্যামব্রিজে অধ্যায়নরত সুরাইয়া খানম (প্রয়াত), সৈয়দ মোজাম্মেল আলি (বর্তমানে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি), মাহমুদ এ রৌফ, নুরুল আলম, আফরোজ আফগান চৌধুরী (পরে হবিগঞ্জের পি পি), আকতার ইমাম (পরে ব্যারিস্টার), আনিসুর রহমান (পরে ব্যারিস্টার এবং বৃটিশ রানির দেওয়া ওবিই খেতাবপ্রাপ্ত), আমিনুল হক (পরে ব্যারিস্টার এবং মন্ত্রী), আনিস আহমেদ (জনমতের নির্বাহী সম্পাদক), আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার (পরে প্রতিমন্ত্রী), আরশ আলি (পরে ব্যারিস্টার), হাবিবুর রহমান ভুইয়া, আব্দুল মজিদ চৌধুরী মঞ্জু, আব্দুল হাই(পরে সিলেট জেলা বারের সভাপতি), মুজিব, ফজলে রাব্বি খান, সৈয়দ ফজলে এলাহী (পরে ড. এলাহী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), হিজত আলি প্রমানিক (পরে ড. প্রমানিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), আক্তার ফেরদৌস লাকী প্রমুখ। বাম রাজনীতির সাথে জড়িত নিখিলেশ চক্রবর্তী, হাবিবুর রহমান, সাইদুর রহমান মিয়া (পরে ব্যারিস্টার), ডা. নুরুল আলম, রেনু চক্রবর্তী, পরিমল গুহ, শ্যামা প্রসাদ ঘোষ (পরে ব্যারিস্টার) প্রমুখরাও আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। মার্চ মাসের শুরু থেকেই আমাদের মুখ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে প্রচারণা চালানো, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি। ২৬ মার্চও আমরা তেমনি বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রচারণা চালানোর সময় সুলতান শরিফ জানালেন দেশে গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে, এখনি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির দরজায় অনশন শুরু করতে হবে। তার কথামতো আমি এবং আফরোজ আফগান চৌধুরী স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি, ১০ নং ডাউনিং স্টিটের সামনে অনশন শুরু করলাম। সে সময় প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির চারপাশে এতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বেষ্টনি ছিল না বলে ঠিক তার বাড়ির সামনে ফুটপাতেই শুরু হয় অবস্থান, সেটি ছিল যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে এ ধরনের প্রথম পদক্ষেপ। তখন কোনো দফতর ছিল না। তাই অনশনের বিশাল জায়গায় ছুটে আসতো শত শত বাঙালি। স্থানটি পার্লামেন্টের কাছে হওয়ায় পার্লামেন্টের অনেক সদস্যও চলে আসেন আমাদের কথা শুনার জন্য, আসেন বহু সাংবাদিক, টুরিস্ট এবং সাধারণ ইংরেজ। আমাদের অনশনের খবর ছবিসহ বৃটিশ টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচারের কারণে গোটা যুক্তরাজ্যের সব অঞ্চলের প্রচুর লোকের আগমন ঘটায় যান

নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। অনশনের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে বৃটিশ রাজনীতিক, সাংবাদিকদের মধ্যে আমাদের দাবিসমূহ জানাজানি হয়, যার মধ্যে ছিল বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান, পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ এবং আর্থিক সাহায্য বন্ধ করা। অনশনকালে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে যেসব এমপি এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল বার্নস, ব্রুসডগলাস ম্যান, জন স্টোন হাউস, আর্থার বটম লি, টবি জেসেল, ডেনিস হিলি, টনি বেন, লর্ড ব্রুকওয়ে, লেডি গ্রীফিথ। এছাড়াও এসেছিলেন শ্রমিক নেতা আর্থার স্কারগিল, গ্রেটার লন্ডন কাউন্সিল প্রধান কেন লিভিং স্টোন, মানবাধিকার নেতা জন এনালস, এমনেস্টি প্রধান মার্টিন এনালস, সাংবাদিক ডেভিড উইম্বলবি, ডেভিড ফ্রস্ট, বিবিসির কমল বোস, সেরাজুর রহমান, শ্যামল লোধ, দীপঙ্কর ঘোষ। তিনদিন পর সংসদ সদস্য এবং প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার শোর এসে আমাদের অনশন ভঙ্গ করার সময় এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করেন যে পরদিনই বৃটিশ পার্লামেন্টে পাকিস্তানিদের দ্বারা গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে পিটার শোর সাহেব পরদিনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করান। তবে সেদিন মাত্র ৩০ জন সে প্রস্তাবের পক্ষে অংশ নেন। ক্রমান্বয়ে আমাদের প্রচারণার ফলে বৃটিশ পার্লামেন্টে আমাদের সমর্থন বাড়তেই থাকে। পরবর্তীতে সেখানে বহুবার পাকিস্তান বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয় যাতে আরো অধিক সংখ্যক সদস্য অংশ নিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সামনে অনশন করেছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আব্দুল হাই এবং রিজিয়া চৌধুরী। মে মাসে পাকিস্তান ক্রিকেট দল বিলেতে গেলে আমরা বৃটিশ জনগণের মধ্যে তাদের খেলা বর্জন করার দাবি সফলতার সাথেই পৌঁছাতে পেরেছিলাম বলে তাদের খেলা দেখতে লোক সমাগম হয়নি। তাদের সম্মানে দেওয়া অনুষ্ঠানও আমরা পন্ড করতে পেরেছিলাম। বৃটিশ পত্র পত্রিকায় লেখালেখি এবং বিজ্ঞাপন প্রদানও আমাদের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল।

পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে ধর্না দেওয়া ছাড়াও লন্ডনে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে প্রচারণা চালানোও আমাদের কার্যাবলির অংশ ছিল। বৃটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে প্রচারণা গতিশীল করার জন্য আমরা মূল তিনটি দল, যথা শ্রমিক দল, রক্ষণশীল দল এবং উদারনৈতিক দলগুলোর বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে প্রচারণা চালাতাম এবং বক্তৃতা প্রদান করতাম, কেননা তাদের সম্মেলনগুলোতে শীর্ষ নেতাসহ অনেক বেশি সংখ্যক সদস্য পাওয়া যেতো। এসব সম্মেলনে আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিলাম এই অর্থে যে তিনটি দলই এক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতি, গণহত্যা বন্ধ এবং পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিলেতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা এবং প্রচারণার মাধ্যমে আমরা সে দেশের ছাত্র এবং শিক্ষক সমাজের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলাম। বৃটিশ জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করতাম। এপ্রিল মাসে পল কনেট এবং মেরিয়েটা প্রকোপের নেতৃত্বে কয়েকজন ইংরেজ বাংলাদেশের গণহত্যায় মর্মাহত হয়ে 'একশন বাংলাদেশ' নামে যে সংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় এবং কর্মকান্ডে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকা রাখতে হয়েছিল। সেই সংস্থার জন্মের পর বিলেতে বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এদের আয়োজনে। ১ আগস্ট কেন্দ্রীয় লন্ডনের ট্রাফালগ্যার স্কোয়ারে যে বিশাল সম্মেলন হয় তাতে বাঙালি-অবাঙালি মিলে প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাবেশ হয়, যাতে কয়েকজন বৃটিশ লর্ড এবং এমপি ভাষণ দিয়ে গণহত্যা বন্ধে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ ছাড়াও বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতির দাবি তোলেন। এর আগে জুলাই মাসেও তারা একই জায়গায় সম্মেলন করেন যখন শ্রী বিমান বসু বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকেট প্রদর্শন করেন। অগাস্টের সম্মেলন শেষে অপারেশন ওমেগা নাম ধারণ করে পল কনেট এবং তার স্ত্রী এলেন কনেটের নেতৃত্বে একটি ত্রাণ এবং ঔষুধবাহী গাড়ির বহর বাংলাদেশে রওয়ানা হয়, যদিও যশোরে পাকিস্তানি সেনারা তাদের আটক করেছিল। ফজলে হাসান আবেদ (পরে স্যার ফজলে হাসান) একশন বাংলাদেশের কর্মকান্ডে অংশ নিতেন। শুরু থেকেই পাকিস্তান দূতাবাসের তিনজন কূটনীতিক যথা মহিউদ্দিন আহমেদ, লুৎফল মতিন এবং হাবিবুর রহমান আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্ম হয় জেবুন্নেছা বখত ও আনোয়ারা জাহানের নেতৃত্বে। মহিলা পরিষদের নেতৃত্বে আরো ছিলেন রাবেয়া ভুইয়া (পরে ব্যারিস্টার), মিসেস খায়ের, ডা. হালিমা আলম, সেলিনা মোল্লা, শেফালি, শেলি, ফেরদৌসি রহমান, রাজিয়া চৌধুরী প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমেও প্রচারণা চালানোর জন্য বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন এনামুল হক (পরে জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক, ডক্টর এনামুল হক), মুন্নি রহমান, রুনি সুলতানা, ফাহমিদা মঞ্জু মজিদ, মুজাহিদ, আফরিন কামাল প্রমুখ । অন্যান্য মর্যাদায় ভূমিকা রেখেছিলেন শিল্পি আব্দুর রউফ (যিনি পরে আমাদের সংবিধান লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং ফিল্ম আর্কাইভের প্রধান হয়েছিলেন), ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন, রাজিউল হাসান রঞ্জু (পরে রাষ্ট্রদূত), শামসুল মোর্শেদ লাভলু (পরে ব্যারিস্টার ও রাষ্ট্রদূত), অধ্যাপক কবির, জাকিউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ মোবাচ্ছির (আলো) চৌধুরী, ব্যারিস্টার শাহ ফেরদৌস, ফজলে রাব্বি মাহমুদ হাসান (পরে ড. ফজলে রাব্বি মাহমুদ হাসান), মতিউর রহমান চৌধুরী, গাউস খান (যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি), তৈয়বুর রহমান, আতাউর রহমান খান, হরমুজ আলি, মিম্বর আলি, ইসহাক, আহমেদ হোসেন জোয়ার্দার, রাজ্জাক খান প্রমুখ। লন্ডন ছাড়া অন্যান্য শহরেও আন্দোলন হয়েছিল। বার্মিংহ্যামে নেতৃত্ব দেওয়াদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জগলুল পাশা ও তার স্ত্রী, তোজাম্মেল (টনি) হক প্রমুখ। ম্যানচেস্টারে মতিন সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে পরামর্শ দান করতেন বঙ্গবন্ধু গবেষক এবং বহু বইয়ের লেখক আব্দুল মতিন এবং বিবিসির সেরাজুর রহমান। মে মাসে ফরাসিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়ার জন্য দাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে যেয়ে আমরা পাকিস্তানকে সাহায্য না দেওয়ার দাবি জানালে সংস্থাটি পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করেছিল। আমরা ইউরোপের কয়েকটি দেশে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পাকিস্তান কর্তৃক চালিয়ে যাওয়া গণহত্যার কথা পৌঁছাতে পেরেছিলাম। এক সময় বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন নামে ডাক্তারদের সংগঠন তৈরি হয় যাতে ছিলেন ডা. হাকিম, ডা. আলম, ডা. হালিমা আলম, ডা. জোয়ার্দার, ডা. হাফিজসহ বেশ কয়েকজন ডাক্তার। কিছু সময়ের জন্য ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীও (রণাঙ্গনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত) ঐ সংস্থায় ছিলেন। মুজিবনগরে এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর আমরা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই।

যুক্তরাজ্য সরকার তখনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিলেও আমাদের মিশন প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধা দেয়নি। যুক্তরাজ্যের ভারতীয় দূতাবাস সার্বক্ষণিক আমাদের সহায়তায় ছিল। নভেম্বর মাসে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী লন্ডনে এলে তিনি বাঙালি ও ভারতীয়দের এক মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন, যা বাস্তবায়িত করতে আমাদেরও ভূমিকা ছিল। সেই সভায় শ্রীমতি গান্ধী ইঙ্গিত দিলেন ভারত শিগগির প্রত্যক্ষ সমরে নামবে। ৬ ডিসেম্বর ভারত এবং ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর আমরা আনন্দে ফেটে পড়ি এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানাতে যাই। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ খবরের পর সকল বাঙালিই আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছিল। বিলেতে অবস্থানরত বাঙালিদের কর্মকাণ্ডের পুরো ফিরিস্তি দিতে আরো অনেক কিছু লেখার প্রয়োজন রয়েছে, যাদের নাম লেখা হয়েছে তার বাইরেও আরো অনেক লোক অবদান রেখেছেন, তাদের কর্মকাণ্ড ছিল অনেক ব্যাপক। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস কাল তারা যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের দাবির পক্ষে, পাকিস্তানি গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জনমত সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখতে পেরেছিলেন। তাদের এবং অন্যান্য দেশের প্রবাসীদের অবদান স্বীকার করে সরকার ২০১৮ সালে প্রবাসী আন্দোলনকারীদেরও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন, যেটি একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত, কেননা বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে প্রবাসী বাঙালিদের অবদান অনস্বীকার্য।

#

লেখক : আপীল বিভাগের (অবঃ) বিচারপতি

০৮.১২.২০২১ পিআইডি ফিচার